তারিখ ... 16 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

শিশুর নৈতিক শিক্ষা: শিক্ষকদের ভূমিকা

রিফাত মুনীর ইতি

আমরা এমন এক অস্থির সময় পার করছি, যেখানে পারিবারিকভাবে বাবা-মা সময় দিতে পারছেন না সন্তানদের, জীবিকার সন্ধানে নিয়ত ব্যস্ত বাবা কিংবা মায়ের কাছ থেকে সে যে সময়টা পাচ্ছে সেটিকেও কোয়ালিটি টাইম বা কার্যকর, মূল্যবান সময় বলা যাচ্ছে না। ফলে যে ছেলেটি কিংবা মেয়েটি নানান অসামাজিক কাজে ঝুঁকছে, তাকে নিয়ন্ত্রণ করার যোগ্য ও সঠিক ব্যক্তিটিকে সঠিক সময়ে দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে না। আর এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকই হতে পারেন সেই যোগ্য, কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি।

প্রশ্ন হলো— একটি সন্তান বাবা-মায়ের অনুশাসনে কতটুকু সময় পার করছে। আদৌ তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে প্রাপ্ত সময়টুকু যথেষ্ট কি? আমরা জানি, এদেশে সকাল হয়, বিশেষত ব্যস্ত শহরগুলোতে শিশুদের আতঙ্কজনক কিন্ডারগার্টেনের নিরানন্দ, অনিচ্ছাকৃত পাঠ দিয়ে। আমরা বইয়ের ভারে জর্জরিত শিশুটির কাছ থেকে কেড়ে নেই তার আনন্দময় শৈশব।

সে খেলা ভুলে যায়, সৃজনশীল নানা কাজে আমরা তাকে ব্যস্ত করি আমাদের ইচ্ছায়,তার আগ্রহে না। ফলে পাঠ্যপুস্তকের প্রতি বীতশ্রদ্ধ এবং একইসঙ্গে প্রচলিত নিয়মতান্ত্রিক জীবনকে একধরনের যন্ত্রণাময় জীবন ভাবা তার জন্য অসম্ভব কিছু নয়। এই অন্তর্গত হতাশা শিশুটিকে ভালো-মন্দ বোঝার আগেই কৌতূহলী করে তোলে বয়ঃসন্ধিকালের নানান পরিবর্তনে, বিষয়টিকে আরো সহজ করে তোলে তার হাতের অনিয়ন্ত্রিত সাইবার জগৎ। ফলে ইভ টিজিং, সহিংস হয়ে ওঠা, মাদক গ্রহণ এবং যৌন হয়রানির মতো ঘটনার সঙ্গে তার যোগাযোগ স্বাভাবিক ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়।

এখন যে সন্তানটি বিদ্যালয় পর্যায়ে প্রায় আট ঘণ্টা শিক্ষকের সঙ্গে সংযুক্ত, বিদ্যালয়ে অবস্থানসহ তার ভালো-মন্দের বিষয়গুলো অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই কিছুটা শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল। এখানে দুটো প্রধান বিষয় জড়িত। প্রথমত, আমাদের প্রচলিত কার্যক্রম কতটুকু সুযোগ দিচ্ছে একজন শিক্ষককে. শিশুর নৈতিক চরিত্র গঠনে? দ্বিতীয়ত, একজন শিক্ষক নিজেই বা এক্ষেত্রে কতটা আন্তরিক। প্রথমটি বিতর্কিত, কারণ অনেকেই এ কথা বলবেন, যে পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই কর্মমুখী শিক্ষা, শিশুর সৃজনশীলতা বাড়াতে চারুকলার মতো বিষয়, এবং বাংলা ও ইংরেজি পাঠ্যক্রমে নানান বিষয়ের অবতারণা, বিশেষত ঐতিহাসিক ন্যনান ঘটনার উল্লেখ শিশুদের নৈতিক চরিত্র গঠনে ভূমিকা রাখবে। অথচ বাস্তবে তার প্রয়োগ কতটুকু তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে। কারণ শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ থাকলে এবং শুধু পরীক্ষা পাসের জন্য শিক্ষার্থীরা যে সাল বা ঐতিহাসিক ঘটনা মনে রাখছে, তা তাদের আত্মিক উন্নতিতে ভূমিকা রাখতে পারছে না। আবার ধর্মীয় গ্রন্থাদি পাঠ ও তার চর্চা, মহামানবদের জীবনী, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনের বিখ্যাত ব্যক্তিদের পরিচিতি পারিবারিক ও প্রতিষ্ঠানিক ভাবে শিশুরা পাচ্ছে না। কারণ শিক্ষকরা যতটা ব্যস্ত তথাকথিত পাঠ্যপুস্তকের শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ততটা শিশুদের বাইরের বইয়ের প্রতি আগ্রহী করে তুলতে নয়, এটিকে তাঁরা সময় ও শ্রমের অপচয় বলে মনে করছেন। আমরা আর্থিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে একটি শিশুর জীবনের মানদণ্ড হিসাবে দেখছি, তাকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে চাচ্ছি না।

মনে রাখতে হবে, একটি শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে শিক্ষকরা বিশাল ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের ব্যক্তিগত আচরণ, পাঠাভ্যাস, সমাজের অন্য মানুষের প্রতি আচরণ, দায়িত্বশীলতা, ক্ষমা ও উদারতার দ্বারা শিক্ষার্থীরা প্রভাবিত হয়। আর শৈশবে যদি একজন শিক্ষক তাদের মাঝে এসব মানবীয় গুণাবলি ঢুকিয়ে দিতে পারেন, তাহলে আজীবন তা শিশুদের জন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে কাজ করবে। আর তার জন্য অবশ্যই শিক্ষদেরও হতে হবে ব্যক্তিগত লোভ-লালসা মুক্ত, সমাজের প্রতিটি সন্তানকে নিজের সন্তান মনে করে তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল, উদার, আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ।

সমাজের একটি সন্তানও যদি বিপথে যায়, তাহলে তার দায় সমাজের একজন প্রতিনিধি হিসাবে শিক্ষকরা এড়াতে পারেন না— এ বোধ তাঁদের থাকা উচিত।

ঢাকা